there was any deviation from the printed notation. I have thoroughly gone through the works of Tagore and also listened to his speeches relating to this subject but nowhere in his writings I have found the poet prescribing any limits to 'Music accompaniment' and also 'Tempo' for recording of his songs. As such, it occurs to me that the Examiner of the Music Board has assumed the role of a 'Dictator' and I am not aware since when this dictatorship was introduced in the Music Board.

You are surely aware that I have been singing and recording Tagore songs for a long time and I feel that my sense of responsibility and seriousness in this regard are in no way less than anybody else. I have seen persons possessing a creative mind engaged in new experiments in their respective sphere of activity who did not like the idea of repeating the existing art-patterns like birds and insects. Their examples were a source of inspiration to me and I, in my own humble way (with the help of your company), tried to do some experiments in my own sphere, I don't know what and how much I have done, but it is a fact that much remains to be done. It is a pity that I have to stop with a heavy heart and it will take some time before I can re-mould my mind to work according to the directives of the Cultural Dictatorship of the V. B. Music Board.

For the present, I would request you to appeal to the Music Board to re-examine may recorded tape and allow some grace marks as a very special case, in consideration of my advanced age and also the huge loss of money for re-recording of the songs, so that the songs are approved.

Yours faithfully

Debabrata Biswas

174E, Rashbehari Avenue, Calcutta

The 16th August, 1969

বোর্ডের কাছে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে অনুরোধ করেন। বোর্ড অবশ্য—পুনরায় অননুমোদন করেন। সাময়িক ভাবে বন্ধ হয় দেবব্রত বিশ্বাসের রেকর্ড করার কাজ। যদিও এই কোম্পানির কর্ণধার চণ্ডীচরণ সাহার অনুরোধে ১৯৭০-১৯৭১ এই দুই বছর বেশ কিছু সংখ্যক গান জর্জদা 'টেপ' করে রাখলেন। পরবর্তীকালে সেগুলি কিছু কিছু করে প্রকাশিত হয়।

অসম্ভব স্বরলিপি জ্ঞান নিয়ে তিনি বিশ্বভারতীর অরাজকতার বিরুদ্ধে, তালিবানি ফতেয়ার বিরুদ্ধে—যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন—পিছু হটেননি। তিনিই সেই বিতর্ক—যিনি বলেন, 'আমি কুনু দিন ও রবীন্দ্রনাথরে গুরুদেব গুরুদেব করি নাই।" এ বড়ো বেদনার মত যেন ভেসে আসে— অভিমানী ভাষ্যের মত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মিকতায়—তিনি গান গাইলে মনে হয়—'গান তো নয় যেন মন্ত্র'। তাঁকে নিয়ে, তাঁর গান নিয়ে যে বিতর্ক সেই সময় আগুন জ্বেলেছিল— আজ মুক্ত কপিরাইটের যুগে কেমন যেন অর্থহীন হাস্যকর মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে, গানকেই সঙ্গী করে একলা পাগল বিপ্লব করেছেন, একটা পাথর সরাচ্ছেন বুকের থেকে, আমরা বুঝিনি তা, সে যুগে। একটা ও প্রতিবাদ করিনি। তবু সে মানুষটা একাই হেঁটেছেন। ১৯৭৮ সালে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু নমঃশুদ্রদের ক্ষেপ প্রকল্পের জন্য বিনা পয়সায় গান ধরেছেন। তাঁকে মঞ্চে উঠতে দেখেই দর্শক শ্রোতাদের কী উন্মাদনা। একের পর এক গান ধরছেন—যেন বিমুক্ত স্পর্ধা। রবীন্দ্রনাথের গানকে সাধারণের করেছেন তিনিই—উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি। পরনে যাঁর লুঙ্গি আর ফতুয়া, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ। বাঁধা গতের রাবীন্দ্রিক **STYLE** এর বিরুদ্ধ **ICON**।

'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গাইছেন কিংবা গাইছেন 'মহারাজ এ কি সাজে' —শ্রোতাদের পৌঁছে দিচ্ছেন Mystic

অনুভূতির অতীন্দ্রিয় এক রহস্যের জগতে —বেদান্তিক অনুভূতির স্পর্শ রেখে যাচ্ছেন—জীবনযাত্রায় Most অরাবিন্দ্রীক এই মানুষটি। তাঁর ট্রাঙ্গুলার পার্কের পাশেই ১৭৪ ই রাসবিহারী এভিনিউর বাড়ির দরজা হাট করে খোলা—চলছে গান-আড্ডা-গান-গানের ক্লাস। গানের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ সুবীর সেন, অর্ঘ্য সেন, চিরঞ্জিত গুহ, স্বপন গুপ্ত, আরতি মুখোপাধ্যায়, অদিতি সেনগুপ্ত, পূরবী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী সেন, বিভা সেনগুপ্ত।

নাটক, চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় এবং নেপথ্যে কণ্ঠদানের বিষয়টি উল্লেখ না করলে অপূর্ণ থেকে যাবে—। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে মুক্তি পায় হেমেন গুপ্ত পরিচালিত 'ভুলি নাই' ছবিটি। এই ছবিতে চারণকবি মুকুন্দদাসের চরিত্রে অভিনয় ও গান করেন। ১৯৬১ সালে ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবিতে ছোট চরিত্রে অভিনয় করেন। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রথম কয়েকটি 'শো' তে অভিনয় ও করেন। বহুরূপীর 'ছেঁড়া তার' নাটকে 'মহিম' এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। চল্লিশের দশকে 'অভিযাত্রী' ছবিতে কনক বিশ্বাস এর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে নেপথ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন, ষাটের দশকে 'দাদা ঠাকুর' ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এর সুরে ছবি বিশ্বাসের লিপে নেপথ্য কণ্ঠদান করেন। তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন ১৯৬০ সালে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে তাঁর গাওয়া 'যে রাতে মোর দুয়ার গুলি' গানের জন্য। ১৯৬১ সালে 'কোমল গান্ধার' ছবিতে 'অবাক পৃথিবী', 'নব জীবনের গান' করেন।

চিরকালের খামখেয়ালী, বেহিসাবী, উদ্দাম, উচ্ছল, ভড়ংহীন, জর্জদা আধশোয়া ইজি চেয়ারে, খাটের ওপর বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিটোনো বই-কাগজ পত্র, Inhaler (হাঁপানির ওষুধ), টেবিলে হারমোনিয়াম—কয়েকটি মোড়া-এই একটি ঘরের অধীশ্বর গাইছেন—'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো।' অকৃতদার তিনি জীবনকে, প্রথাকে বারবার ধাক্কা দিয়েছেন। ভেঙ্গেছেন। ভেঙ্গেছেন তিনি নিজেও— বারবার তিনি আপনজনের থেকে আঘাত পেয়ে। বাহ্যিক খুশির অভিব্যক্তি রেখেছেন, গানে গানে কষ্ট ভুলেছেন। ছোটো বোন ললিতার আজন্ম রুগ্ন ছেলে খোকনের মৃত্যু তাঁকে বড় আঘাত দিয়েছিল। মনের সব জ্বালা, যন্ত্রণা, পক্ষের যুক্তি, অভিমান, আবেগ মিশিয়ে একটি বই লিখলেন 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'। এটি তাঁর লেখা দ্বিতীয় বই। (প্রথম বই 'অন্তরঙ্গ চীন', খালেদ চৌধুরীর উদ্যোগে প্রকাশিত)।

১৯৮০, ২১ মার্চ। ভীড় ঠাঁসা রবীন্দ্রসদন—অগনিত দেবব্রত অনুরাগীর—জর্জ অনুরাগীর উপস্থিতিতে উজ্জ্বল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শ্রী দেবব্রত বিশ্বাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন—বঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রিয় 'কাকা'কে (হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'কাকা বলে ডাকতেন দেবব্রতকে), প্রচার বিমুখ অভিমানী কাকাকে বহুকষ্টে রাজি করালেন। সাধারণের সামনে তাঁর শেষ এই অনুষ্ঠানে তিনি গাইলেন—

'যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে
আমায় ডাকলে কেন গো এমন করে।"

১৮ই আগষ্ট—১লা ভাদ্র—একটি আগুন নিভে গেল, —চিরশান্তিতে 'জর্জদা'। তবে চলে গেলেন না, রয়ে গেলেন, অন্তরে।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত—দেবব্রত বিশ্বাস।

২। গাওয়া, না গাওয়া —দেবব্রত বিশ্বাস।

৩। দেবব্রত বিশ্বাস তথ্যচিত্রের লিখিত রূপ চিত্রনাট্য—সঙ্গীত পরিচালনা—উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

৪। অন্য প্রমা—দেবব্রত বিশ্বাস জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী , ২০১০

৫। রবীন্দ্রসংখ্যা—'পশ্চিমবঙ্গ'

সার্ধ জন্ম শতবর্ষে প্রফুল্লচন্দ্র

শমিত ঘোষ

এ. ডি. এস. আর., মল্লারপুর

সমকালীন বাংলার দুই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব একই বছরে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একজন হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপরজন হলেন বিজ্ঞান তাপস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দুজনেরই এবার জন্ম সার্ধশতবর্ষ। দেশে বিদেশে বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সরকারী, বেসরকারী ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বিশ্বকবির সার্ধ জন্মশতবর্ষ যথোচিত মর্যাদায় সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। এমনকি তাঁর প্রয়াণ দিবসেও যথাযথ শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন অনুষ্টানের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়েছে এই বরেণ্য মহামানবকে। এদিক থেকে দেখতে গেলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সার্ধ জন্ম শতবর্ষেও উপেক্ষিতই রয়ে গেলেন। অথচ তিনি হলেন সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যাঁর মধ্যে মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেমের সাথে বৈজ্ঞানিক মণীষার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। বাঙালী জাতিকে কেরাণীগিরি থেকে মুক্ত করে শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোগী, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান একটি জাতিতে পরিণত করে তার অহংবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই মনীষীর অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন হল না আজও। স্বজাতির দুর্দশায় বেদনাহত বিজ্ঞানী তাঁর 'আত্মচরিত' এ বলেছিলেন "বাঙালি জাতির ভবিষ্যত যে অন্ধকারাবৃত, তাহা বুঝিতে দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।" এই রকম ভবিষ্যতদ্রষ্টা 'জনগণের বিজ্ঞানীর' সার্ধ জন্মশতবর্ষের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য সমগ্র জাতির লজ্জা বলে পরিগণিত হওয়া উচিত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার রাড়ুলি গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায়। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন অ্যালবার্ট স্কুল থেকে। এরপর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে বিলেত যাত্রা করেন। সেখানে প্রথমে বি. এস. সি. পাশ করেন এবং ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে রসায়ণশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. উপাধি ও হোপ পুরস্কার লাভ করেন। দেশে ফেরার পর ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে হন বিভাগীয় প্রধান। ১৯১৬ খ্রীঃ ওই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বপদে আসীন ছিলেন। কর্মোদ্যোগী প্রফুল্লচন্দ্র সামান্য মূলধন সম্বলন করে ১৯০২ খ্রীঃ কলকাতার কাছে পানিহাটিতে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধ তৈরির কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ আবিষ্কার মারকিউরাস নাইট্রাইট, ১৮৯৫ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণাকালে পারদের সাথে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় তিনি এই যৌগ আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে মারকিউরাস নাইট্রাইট এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করেন। যদিও বর্তমানে জানা গেছে এই যৌগটির অস্তিত্ব আছে। মারকিউরাস নাইট্রাইট প্রস্তুতি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। 'Life and experiences of a Bengali Chemist' এ প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন যে তিনি মারকিউরাস নাইট্রেট তৈরির জন্যই এগিয়ে ছিলেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'I became a chemist almost by mistake'.

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রদের প্রতি ছিল পিতৃতুল্য স্নেহ। পরবর্তীকালের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জী তাঁর সক্রিয় সহায়তায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ছাত্রদের গবেষণা

কর্মে উৎসাহ দিতেন এবং সব রকম সাহায্য করতেন। দরিদ্র ছাত্রদের তিনি অকাতরে অর্থ সাহায্য করতেন। ছাত্রদের সাথে নিজের সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর নিজের কথায় 'bonds existing between them & me were as subtle as those of chemical affinity.'

বিশ্ব বন্দিত এই বিজ্ঞানী ১৯২৪ থেকে ১৯৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীঃ তাঁর উৎসাহ ও অর্থ সাহায্যে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় যার নির্বাচিত প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন তিনি স্বয়ং। ১৯১৯ খ্রীঃ তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইট উপাধি লাভ করেন। লণ্ডন ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক সদস্যপদ দান করে। ১৯১০ খ্রীঃ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ও ১৯২০ খ্রীঃ ভারতীয় বিজ্ঞান কমিশনের তিনি মূল সভাপতি ছিলেন।

ইংরাজী ও বাংলায় তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর অত্মচরিত ''Life and Experiences of a Bengali Chemist', 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার', 'অন্ন সমস্যায় বাঙালির পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ' History of Hindu Chemistry' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি যে সাহিত্য ও ইতিহাসে পারদর্শী ছিলেন তা তাঁর আত্মচরিত থেকে জানা যায়। তাঁর আত্মচরিত তৎকালীন বাংলার সামাজিক জীবন ও মানসিকতার এক জ্বলন্ত দলিল।

প্রফুল্লচন্দ্র নিজেকে গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে স্বদেশ ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জনগণের কল্যাণে জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বেতন, সঞ্চিত অর্থ ও পেনশন থেকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করে গেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করে গেছেন। তিনি জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি হিন্দু সামাজিক কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

অকৃতদার প্রফুল্লচন্দ্র অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন গান্ধীজীর খদ্দর প্রচারের অন্যতম উদ্যোক্তা। গান্ধীজীর কথায়, 'It is difficult to believe that the man in simple Indian dress wearing simpler manners could possibly be the great scientist and professor'.

দেশপ্রেমী, পরোপকারী দানশীল এই বিজ্ঞানী রাজনীতিতে যোগ না দেওয়ার কারণস্বরূপ বলতেন.....বস্তুত ক্ষীণ দেহ, স্বাস্থ্য এবং বার্ধক্য রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পক্ষে বাধাস্বরূপ। যদিও 'আত্মচরিত' শেষ হচ্ছে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ে বাঙালী তথা ভারতবাসী কেন পশ্চাৎপদ থাকিবে, তাহাদের জীবন কেন পূর্ণতা লাভ করিবে না, তাহার কোনও কারণ আমি দেখিতে পাই না।..... আমরা মানসনেত্রে আমি একটি মহৎ জাতির নব অভ্যুদয় দেখিতেছি.....'।

১৯৪৪ খ্রীঃ এর ১৬ই জুন এই মহাপ্রাণের প্রয়াণে পরাধীন ভারতবর্ষে বসু-রায়-রামন ত্রয়ীর হাত ধরে বিজ্ঞানচর্চার যে জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল তার অবসান ঘটে।

তথ্যসূত্র ঃ আত্মচরিত-প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭০০ ০৭৩

জন্ম-শতবর্ষে দাদামণি ঃ নীরব শ্রদ্ধার্ঘ

শোভন মণ্ডল

এ. ডি. এস. আর., ভগবানগোলা

জন্মশতবর্ষে পা দিলেন আমাদের প্রিয় 'দাদামণি'। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা যাচ্ছে এই নিয়ে প্রচার সর্বস্ব মিডিয়াগুলিতে তেমন কোন উচ্চবাক্য নেই। এটা বোধ হয় 'দাদামণি'র জীবনের সঙ্গে মিলে যায়। অসাধারণ একজন অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও বরাবর প্রচার মাধ্যম তার উপর তেমনভাবে আলো ফেলেনি অথবা অন্য কেউ প্রচারের আলো চুরি করে নিয়ে গেছে। তাই জন্মশতবর্ষেও তিনি যে প্রচারের থেকে দূরে থাকবেন এটাই তো স্বাভাবিক। এই কারণেই তিনি অশোক কুমার। আমাদের নয়নের মণি 'দাদামণি'।

তিনি ভাই চলচ্চিত্র জগতে সমানভাবে জনপ্রিয়—বিশ্ব ফিল্ম জগতেও এই নিদর্শন খুব একটা দেখা যায় না। গাঙ্গুলী বাড়ির তিন ছেলে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। অশোককুমার, কিশোর কুমার আর অনুপকুমার যেন বাঙালীর ত্রিনয়ন। তিনজনেই জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান হলেও এটা বলতে বাধা নেই যে বড়ভাই অশোক কুমারের ফিল্ম জগতে প্রবেশ তুলনামূলকভাবে কঠিন ছিল। কারণ গাঙ্গুলীর বাড়ির বড়ছেলের অন্তত কোন 'রেফারেন্স' ছিল না। কোলকাতায় পড়াশোনা ত্যাগ করে মুম্বই-এ চলে গিয়েছিলেন ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করতে। হিমাংশু রায় তখন একটি ফিল্ম করছিলেন। নাটকীয় ভাবে পরিচালকের স্ত্রীর সঙ্গে নায়ক পালিয়ে যান। পরে স্ত্রী ফিরে আসলেও পরিচালক নায়ককে তার ওই সিনেমায় নেননি। তখন হিমাংশু রায়ের চোখ পড়ে ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট কুমুদলাল কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলীর, ওপর। তাকেই নায়ক করে তৈরী হল সিনেমা 'জীবন নাইয়া'। সেই বছরই রিলিজ হল আর একটি সিনেমা 'অচ্ছুৎ কন্যা'। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি তাকে। কুমুদলাল কাঞ্জিলাল হয়ে উঠলেন 'অশোক কুমার'। এরপর একের পর এক সিনেমা রিলিজ হতে লাগলো। ইজ্জৎ, বন্ধন, ঝুলা, পরিনীতা, হাটে বাজারে, চলতি কা নাম গাড়ি, মিলি, প্রভৃতি সিনেমা। মোট ২৭৫টি সিনেমাতে তার অভিনয় দীপ্তি দেখা যায়। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর অভিনয় মানুষকে আনন্দ দিয়ে গেছে।

কিন্তু শুরুতেই বলেছি প্রচারের আলো সে ভাবে কখনো তাঁর মুখে পড়েনি। একজন সত্যি সত্যিই ট্রাজিক অভিনেতা হয়েই সারাজীবন তিনি কাটিয়েছেন। অভিনয় জীবনে শুরুতে প্রথম তিনটি ছবির নায়িকা ছিলেন দেবিকারাণী। ছবিগুলি হিট করলেও সমস্ত প্রচার দেবিকারাণীর উপরেই পড়ে। এই গ্ল্যামারাস ও বিতর্কিত নায়িকার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় অশোক কুমারের অভিনয়। শুধু তাই নয় ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় অশোক কুমারের সেই বিখ্যাত ছবি 'মহল'। নায়িকা ছিলেন মধুবালা। তার রূপ ও গ্ল্যামারে এখানেও অশোককুমার ছায়া হয়ে থাকলেন। তাঁর বেশিরভাগ সিনেমাতেই এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায়।

এরপর তাঁর দুইভাই কিশোরকুমার এবং অনুপকুমার সিনেমায় আসেন। তিনজনে একসাথে তিনটি সিনেমায় দেখা যায়। তার মধ্যে 'চলতি কা নাম গাড়ি' সুপার ডুপার হিট হয়। এই ছবি এখনও মানুষ গোগ্রাসে দেখে। অশোককুমার প্রথম জীবনে এতগুলো হিটছবি দেওয়া সত্ত্বেও 'হিরো' হিসাবে তাঁর তেমন নামডাক হয় নি। যদিও কেন হয়নি সেটা একটা রহস্য।

১৯৬০ সালের পর থেকে তিনি পুরোপুরি চরিত্রাভিনয়ে বলে গেলেন। আশীর্বাদ, মিলি, ছোটি সি বাত, খুবসুরত, খাট্টামিঠা বা মিঃ ইন্ডিয়াতে তার ছোট অ্যাপিয়ারেন্স, মানুষের মনে বেশি করে দাগ কেটেছে। তার অভিনয়ের স্টাইল ছিল অণুনকরণীয়। স্বাধীনতার আগে যে ড্রামাটিক বা নাটকীয় ভঙ্গিতে সিনেমায় অভিনয় করা হত, প্রথমে তিনিই তা ভেঙেছিলেন। 'ন্যাচারাল অভিনয়' বলতে আমরা যা বুঝি অশোক কুমারই প্রথম তা শুরু করেন। তাঁর অভিনয় দেখলে মনে হয় অভিনয়ের মতো সহজ ব্যাপার বোধ হয় আর কিছু নেই। যেন অভিনয় নয় বন্ধু বা আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন। এতটাই সহজ সরল ছিলেন তার অভিনয় স্টাইল। সত্যি কথা বলতে কি তার সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে বেশ কয়েকজন এই ধরনের অভিনেতা থাকলেও হিন্দী চলচ্চিত্রে তার সমকক্ষ অভিনেতা ছিল না বললেই চলে।

তবুও কেন তিনি তেমনভাবে প্রচার পাননি? গবেষণা করলে দেখা যাবে তাঁর নিজস্ব প্রচার বিমুখতাও এর জন্য দায়ী। স্টার হতে কখনো চাননি। অভিনেতা হয়েই থাকতে চেয়েছেন। ইন্ড্রাস্ট্রির বড়দাদা 'দাদামণি' হয়েই থাকতে চেয়েছেন। এটাও ঘটনা যে তাঁকে দেখতে তথাকথিত হিরোদের মতো ছিল না। এটা জেনেই তিনি তাড়াতাড়ি চরিত্রাভিনয়ে চলে গেছিলেন। তাঁর সাংসারিক জীবনও খুব একটা সুখের ছিল না। স্ত্রীর অতিরিক্ত মাদকাসক্তির জন্য। সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো। ডিভোর্সও হয়ে গেছিল বলে শোনা যায়। ট্রাজেডি যেন তার জীবনের অঙ্গ হয়েই গেছিল।

দর্শকদের অভিনন্দন ছাড়াও পুরস্কার অবশ্য তিনি কম পাননি। ভারতীয় চলচিত্র জগতের প্রায় সমস্ত পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ১৯৫৯ পেয়েছেন সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার। চারবার ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। সেরা অভিনেতা হিসাবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন 'আশীর্বাদ' সিনেমার জন্য। ১৯৮৮ সালে পেয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেরা পুরস্কার 'দাদাসাহেব ফালকে'। পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ'। এছাড়াও রয়েছে আরও নানান পুরষ্কার তাঁর ঝুলিতে। তবে এই নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। দেবকারাণী 'দাদাসাহেব' পেয়েছেন ১৯৬৯ সালে। অশোক কুমার পেলেন তার ঊনিশ বছর পর। কেন তিনি এত দেরিতে পেলেন সেটা একটা রহস্য।

২০০১ সালে তাঁর মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্রের মহীরুহপাতন। ছয়টি শতক ভারতীয় চলচ্চিত্র জগৎ তাঁর ছত্রছায়ায় ছিল। সকলের একান্ত অভিভাবক ছিলেন প্রিয় দাদামণি। আজ তাঁর জন্মশতবর্ষে তাই এই নীরবতা আমাদের আশ্চর্য লাগে। কিন্তু আশ্চর্য লাগলেও এটাই তাঁর জীবন। মৃত্যুর পরেও বদলায়নি। প্রচার বিমুখ এই মহান অভিনেতা অন্তরালে থাকতে ভালোবাসেন। অভিনয়ের জাল বুনে আমাদের বিস্ফারিত করেননি, দিয়ে গেছেন মুগ্ধতার পেলব স্পর্শ। হয়তো মানুষের, মিডিয়ার এই নীরবতাই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ। হয়তো এই নীরবতাতেই সায় ছিল তাঁর। ১৯৮৭ সালে কিশোরকুমারের মৃত্যুর পর নিজের জন্মদিন পালন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই আমরাও তাঁকে জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানাবো। তবে নীরবে.....নিঃশব্দে.....।

দেশ - স্বদেশ

বঙ্গভঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথ

বিভূতিভূষণ মণ্ডল
এ. ডি. এস. আর., বালুরঘাট

লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করেছিলেন ১৯৫০ সালের ১৯শে জুলাই। পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিলেন বাংলার ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজার, আসামের চীফ কমিশনার ফুলার এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব রিজলী। বঙ্গভঙ্গের কারণ হিসেবে বলা হল প্রশাসনিক সংস্কার। ঢাকাকে রাজধানী করে উত্তরবঙ্গ, আসাম এবং পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) নিয়ে গঠিত হবে একটি নতুন প্রদেশ, ফলে শাসনকার্যে গতি আসবে। নব্যগঠিত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছিলেন মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু। তাদের মধ্যে শিক্ষিত যারা তাদের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক উত্তরণ ঘটবে। কিন্তু নেপথ্যে ছিল কার্জনের জটিল মনস্তত্ত্ব। বাংলা এবং বাঙ্গালীকে বিভাজিত করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। দীর্ঘ আন্দোলন করে ১৯১১ সালে দিল্লীতে রাজা পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করলেও ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য যে বাস্তবায়িত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই। ১৯০৫সালের ১৬ই অক্টোবর লর্ড মিন্টো-র আমলে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়। তার বিরুদ্ধে যে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তা মুসলমানদের শঙ্কিত করে। ১৯০৬ সালে সলিমুল্লাহ'র নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তী রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে অতিমাত্রায়। শুধু তাই নয়, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষদের নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর এ আহ্বানে খুব একটা উদ্বেলিত হতে পারেন নি। যারা তাদেরকে শিক্ষার আলো থেকে, মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তাদের হঠাৎ প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান তাঁকে অবাকই করেছিল। এতদসত্বেও বহু শিক্ষিত মুসলিম এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করে বড়াই করে বলেছিলেন—

"বঙ্গভঙ্গ একটি স্থায়ী ঘটনা— এর কোন নড়চড় হবে না।" ("The partition of Bengal is a settled fact.") তার প্রত্যুত্তরে চ্যালেঞ্জের সুরেই সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন —"আমি এই স্থায়ী ঘটনা, অস্থায়ী করে দেব।" ("I will unsettle the settled' fact.") বস্তুতঃ এই স্থায়ী ঘটনাকে অস্থায়ী করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি নেমে এসেছিলেন রাজপথে, লিখেছেন অনেক স্বদেশী গান যা সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হত। বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর গান। তিনি প্রবর্তন করেছিলেন 'রাখীবন্ধনে'র যা আজও উদ্‌যাপিত হয় সম্প্রীতির বন্ধন হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের কাছে সবিশেষ ঋণী, পদ্মা, শিলাইদহ সবাই তো ওপারে। শুধু জন্মেছিলেন কলকাতার ঠাকুরবাড়ীতে। কিন্তু তাঁকে রবীন্দ্রনাথে পরিণত করেছে পদ্মা, শিলাইদহ। এছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষের শেকড় ছড়িয়ে আছে ওপার বাংলায়। তাই বাংলা বিভাজন তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করল। তিনি তাঁরই প্রকাশ ঘটালেন গানের মধ্যে দিয়ে। "Our sweetest songs one those that tells of saddest thoughts." ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, বাংলা ৩০শে আশ্বিন কবি নগ্নপদে রাজপথে এসে দাঁড়ান এবং এক বিরাট মিছিল নিয়ে গঙ্গাস্নান সেরে এসে দুই বাংলার মিলনের প্রতীক 'রাখীবন্ধন' উৎসব পালন করেন। ৩০শে আশ্বিন বিকেলের শোভা যাত্রায় তিনি গেয়েছিলেন—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান" —এই গানটি। সমবেত কণ্ঠে এই গানের আবেগ বাঙালীকে দেশপ্রেমের জোয়ারে ভাসিয়েছিল।

৩০শে আশ্বিন ইংরেজী ১৬ই অক্টোবর সারকুলার রোডের ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে প্রায় ৫০ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন অসুস্থ আনন্দ কুমার বসু। সভায় বাঙ্গালী জাতির ঐক্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন শপথগ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে একটি ছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জন। রবীন্দ্রনাথ এই শপথ সূচীর একটির বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন।

৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ কার্যকারী হবার দিনে রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসবের সূচনা করেন। অবশ্য এই উৎসব পালনের পরিকল্পনা তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন ১৯০৫ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর। সেদিনই তিনি লিখেছিলেন —"বাংলার মাটি, বাংলার জল...." গানটি। এই গানটি সেই সময় 'রাখী সঙ্গীত নামেই পরিচিতি লাভ করেছিল।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— "আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙ্গালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙ্গালীর রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখি বন্ধনের মন্ত্রটি এই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।"

'বেঙ্গলী পত্রিকায় রাখিবন্ধন উদ্‌যাপনের বিধি-ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছিল বাংলা ভাষায়—

দিন—এই বছর ৩০শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর আগামী বৎসর হইতে আশ্বিনের সংক্রান্তি।

ক্ষণ—সূর্যোদয় হইতে রাত্রি ১৪ প্রহর পর্যন্ত

নিয়ম—উক্ত সময় সংযম পালন

উপকরণ— হরিদ্রাবর্ণের তিন সূতার রাখী

মন্ত্র—ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই

অনুষ্ঠান— উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান বিচার না করিয়া ইচ্ছামত বাঙ্গালীমাত্রেরই ডান হাতে রাখী বাঁধা। অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সঙ্গে মন্ত্র লিখিয়া ডাকে বা লোকের হাতে রাখী পাঠাইলেও চলিবে।'

১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলকাতায় হরতাল পালিত হয় বিপুল আবেগ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনে তিনি যে কতটা আলোড়িত হয়েছিলেন তা সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তাঁর সংলাপে বোঝা যায়— "সামনে যাকে পেতাম, তারই হাতে বাঁধতাম রাখী। সরকারী পুলিশ এবং কনস্টেবল্‌দেরও বাদ দিতাম না। মনে পড়ে, একবার একজন কন্‌স্টেবল হাতে জোড় করে বলেছিল, মাফ করবেন হুজুর, আমি মুসলমান।"

১৯০৫ সালে ৭ই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', গানটি গেয়েছিলেন। সুরটি তিনি অণুকরণ করেছিলেন শিলাইদহের ডাক পিওন গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।"—থেকে। বলার অপেক্ষা রাখে না এই গানটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করে ছিল। আজও এই গানটি বাংলাদেশের লক্ষকোটি মানুষের কণ্ঠে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয় "জাতীয় সংগীত" হিসেবে। এ বিরল কৃতিত্ব শুধু রবীন্দ্রনাথের একার।

এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২৩টি স্বদেশী সংগীত রচনা করেছিলেন। তাঁর গানের মধ্যে বিপ্লবীরা খুঁজে পেতেন দেশের জন্য কর্মের প্রেরণা এবং জন্মভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ। তাইতো তাদের লড়াইয়ের অঙ্গ ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। ১৯০৮ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় উল্লাস দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলেও তিনি সেই রায় ঘোষণার সময় গাইতে থাকেন রবীন্দনাথের গান—

"সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে"। এছাড়া তাঁর বিখ্যাত "সুপ্রভাত" কবিতার এই লাইনগুলি তখন বিপ্লবীদের মুখে মুখে ঘুরত—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তেজনায় অনেক জাতীয় চেতনা সম্পন্ন গান রচনা করেছিলেন। রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' বঙ্গভঙ্গ পর্বে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের নীতিতে তীব্র প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। প্রবল জনজোয়ারের চাপে দিল্লীতে লর্ড-হার্ডিঞ্জ-২ এর দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করলেন।

এই ১৯১১ সালেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'জনগনমন অধিনায়ক' নামক বিখ্যাত গানটি। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের উদ্বোধন হয় এই গানটি দিয়ে। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে এই গানটি আবার উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়। এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই গানটি "ভারত ভাগ্যবিধাতা' নামে ব্রাহ্মসংগীত হিসেবে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এই গানটি নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক দেখা দেয়। ইংলিসম্যান, স্টেটসম্যান একে প্রথমে রাজভক্তির গান বলে প্রচার করল। অবশ্য এই দু'টি পত্রিকা ১৯১৭ সালে লিখল যে একটি দেশভক্তির গান। সমালোচনায় বিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ। বলা হল রাজা পঞ্চম জর্জ এবং তাঁর পত্নীর সম্মানে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এক বন্ধু ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। রাজদরবারে তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি বারবার রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন রাজা পঞ্চম জর্জের জয়গান রচনা করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর মনে উত্তাপও সঞ্চারিত হয়েছিল। পুলিন বিহারী সেনকে তিনি লিখেছেন—

"তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি 'জনগনমন অধিনায়ক' গানে সেই ভারত ভাগ্য বিধাতার জয় ঘোষণা করেছি। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যর রথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জ-ই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সেকথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করে ছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।"

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে তিনি বললেন—

"শুনলে গানটা? কী রকম কাণ্ড দেখ! সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভ্যর্থনার জন্য গান লিখতে ফরমায়েশ এল। মোটেই উৎসাহ ছিল না। কিন্তু বারে বারে অনুরোধ আসাতে বললুম দেখি। কয়েক দিন গেল, কিছুই হয় না। তারপরে একদিন বসলুম—কিন্তু সেই লিখতে আরম্ভ করেছি, কোথায় ভেসে গেল পঞ্চম জর্জ—সে কথা আর মনেও রইল না—গান চললো আরো অনেক বড় সম্রাটের অভিমুখে।"

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে 'জনগণমন অধিনায়ক' হচ্ছেন জগদীশ্বর যার অঙ্গুলিহেলনে গোটাবিশ্ব পরিচালিত। নির্দিষ্ট দেশপ্রেমের প্রেক্ষিতে তিনিই ভারতভাগ্যবিধাতা। তাছাড়া সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় কংগ্রেসের ১৯১১ সালের কলকাতা অধিবেশনে রাজদম্পতির (পঞ্চম জর্জ এবং তাঁর পত্নী মেরী) প্রশস্তিমূলক যে স্বাগত সঙ্গীত গাওয়া হয়েছিল তা লিখেছিলেন রামভুজ দত্তচৌধুরী হিন্দীতে। তাতে কি সমালোচনা থেমে যায়? সমালোচনা বিলাসীরা রবীন্দ্রনাথকে রাজভক্ত বলে প্রচার করতেই লাগলেন। ১৯৩৯ সালে সুধারাণী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন—

"শ্বাশত মানব ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের চির-সারথি বলে আমি ৪র্থ বা ৫ম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যারা সন্দেহ করতে পারেন, তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।"

কিন্তু জাতি আস্থা রেখেছে রবীন্দ্রনাথেই। তাইতো তাঁর 'জনগনমন-অধিনায়ক' আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। সার্ধশতবর্ষে তিনি আরও প্রাসঙ্গিক। ২০১১, বঙ্গভঙ্গ রদের শতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যরা বঙ্গভঙ্গ আটকাতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতীয় নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতার জন্য তাঁর সাধের বাংলা, সোনার বাংলার পাকাপাকি ব্যবচ্ছেদ ঘটল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। জানিনা বেঁচে থাকলে তখন তিনি খণ্ডিত স্বাধীনতা, খণ্ডিত বাংলার অস্তিত্ব কীভাবে মেনে নিতেন?

সূত্র—

(১) রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি—বিজলী সরকার

(২) গুরুচাঁদ চরিত—মহানন্দ হালদার

(৩) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী —ননীগোপাল দেবদাস

রাজধানী স্থানান্তরীকরণের ইতিহাস

ইন্দ্রদীপ ঘোষ

এ. ডি. এস. আর. জাঙ্গিপাড়া

১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র স্বদেশী আন্দোলনে ব্রিটিশরাজ জর্জরিত। তখনই ব্রিটিশ সরকার বুঝে যায় ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনের ভরকেন্দ্র হল বাংলা এবং ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়ত করতে হলে এই বাংলার বিপ্লবীশক্তির মোকাবিলা করাই হবে প্রধান কর্তব্য। কারণ পাঞ্জাব বা মহারাষ্ট্রের মত এই বিপ্লবের চরিত্র কেবল বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাত করা নয়, বরং নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শক্তির অবসান ঘটানোর প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করা। তাই প্রধানতঃ বাংলার বিপ্লবীশক্তিকে দুর্বল করে দেওয়োর জন্য রাজধানী স্থানান্তরিত করার ভাবনা। যদিও অনেক আধুনিক ইতিহাসবেত্তাই এই যুক্তির সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে মুঘল সাম্রাজ্যের অনুকরণে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর অবশ্যম্ভাবীই ছিল।

রাজধানী পরিবর্তনের পক্ষে প্রশাসনিক স্তরে কয়েকটি বাহ্যিক কারণও উল্লেখযোগ্য—

● কলকাতায় রাজধানী রেখে দূরবর্তী বম্বে প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী শাসন করা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছিল। তুলনায় দিল্লী হল বম্বে প্রেসিডেন্সী ও বাংলা প্রেসিডেন্সী থেকে প্রায় সমদূরবর্তী।

● ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশরা সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিল উত্তর পশ্চিম ভারতের সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে। তাই সুরক্ষার জন্য তাদের নৈকট্য ব্রিটিশদের প্রয়োজন ছিল।

● ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের মাধ্যমে ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মুসলিমদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। দিল্লী হল উত্তর ভারতের প্রায় কেন্দ্রস্থল। তাই দিল্লী থেকে এই বিভাজন প্রক্রিয়ার রূপায়ণ সহজতর ছিল।

● আন্তর্জাতিক দিক থেকে দিল্লীর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর পশ্চিম ভারত তথা আফগানিস্তানের পথে শক্তিশালী বিদেশী শক্তির সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে রাজধানী হিসাবে দিল্লীর ভৌগোলিক অবস্থান কলকাতার চেয়ে বাস্তবিক অনেক সুবিধাজনক।

অবশ্য কলকাতা রাজধানী থাকাকালীন সময়েও দিল্লী ইংরেজদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। তার প্রমাণ দিল্লীর করোনেশন পার্কের তিনটি দরবার। প্রথমটি ১৮৭৭ সালের মহারাণীর ঘোষণাপত্র উপলক্ষ্যে। দ্বিতীয়টি ১৯০৩ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড -এর সিংহাসনারোহণের উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই আড়ম্বরপূর্ণ দরকার অনুষ্ঠিত হয়। আর তৃতীয় দরবারটি রাজা পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেকের উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয়। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর এই দরবারেই রাজা পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করেন ঃ

''We are pleased to announce to our people that on the advice of our Ministers tendered after consultation with our Governor General in council, we have decided upon the transfer of the seat of the Government of India from calcutta to the ancient capital Delhi....."

দিল্লীকে রাজধানী ঘোষণা করার পরে Delhi Town Planning নামে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যায়। স্যার এডুইন লুটিয়েন্স, হারবার্ট বেকার এবং জন এ. ব্রডি ছিলেন এই কমিটির সদস্য। তাঁরাই নতুন করে দিল্লী শহরের রূপরেখা তৈরী করেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত দিল্লীই ভারতের রাজধানী রূপে বিরাজমান।